بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ নভেম্বর, ২০২১ মোতাবেক ১২ নবুয়্যত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বিগত খুতবাগুলোতে হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল, আজও তা-ই অব্যাহত থাকবে। হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর জগতের প্রতি অনাসক্তি এবং সংসার বিমুখতা ও তপস্যার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি একবার নিজ সম্মানিত পিতাকে একথা বলে সম্বোধন করেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এই বলে সম্বোধন করেন যে, হে আমার পিতা! আল্লাহ্ তা'লা রিযক সম্প্রসারিত করেছেন আর আপনাকে বিজয় দান করেছেন এবং অঢেল ধনসম্পদ দান করেছেন। আপনি কেন নিজের খাদ্যের চেয়ে অধিক নরম খাবার গ্রহণ করেন না আর আপনার এই পোশাকের চেয়ে অধিক নরম পোশাক পরিধান করেন না? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তোমার কাছেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত চাইব। তোমার কি মনে নেই যে, মহানবী (সা.)-কে তাঁর জীবনে কত কষ্টের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হতে হয়েছে! বর্ণনাকারী বলেন, তিনি অব্যাহতভাবে হযরত হাফসা (রা.)-কে এই কথা স্মরণ করাতে থাকেন, এমনকি হযরত হাফসা (রা.)-কে কাঁদিয়ে দেন। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যতক্ষণ আমার সামর্থ্য থাকবে আমি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের কষ্টের অংশীদার থাকব, হয়ত এভাবে আমি তাদের উভয়ের প্রশান্তিপূর্ণ জীবনেও অংশীদার হতে পারব।

একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-কে বলেন, হে হাফসা বিনতে উমর! তুমি স্বজাতির মঙ্গল কামনা করেছ, কিন্তু নিজ পিতার মঙ্গল কামনা কর নি। অর্থাৎ এই যে পরামর্শ তুমি আমাকে দিয়েছ যে, এমনটি হলে আমি তোমার জাতির সেবা উত্তমভাবে করতে পারব, এটি আমার হিতাকাঙ্ক্ষা নয়। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, আমার পরিবারের সদস্যদের কেবল আমার প্রাণ ও আমার সম্পদের ওপর অধিকার রয়েছে, কিন্তু আমার ধর্ম এবং আমার আমানতে তাদের কোন অধিকার নেই। অর্থাৎ আমি আমানতের যে দায়িত্ব পালন করছি আর যেভাবে পালন করছি সেক্ষেত্রে আমাকে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই আর এ সম্পর্কে বলার কোন অধিকারও তোমার নেই।

হযরত ইকরামা বিন খালেদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাফসা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) এবং এছাড়াও আরও কতিপয় ব্যক্তি হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আলোচনা করার সময় বলেন, আপনি যদি আরো উত্তম খাদ্য গ্রহণ করেন তাহলে সত্যের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমাদের সবার কি একই মত? তখন তারা বলে, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি আমার উভয় বন্ধু, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে যে পথে রেখে এসেছি, তাদের উভয়ের সেই পথ যদি আমি পরিত্যাগ করি তাহলে চূড়ান্ত গন্তব্যেও আমি তাদের উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ পাব না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগ বিপদসংকুল যুগ ছিল। তখন তিনি মুসলমানদের যেসব নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আমরা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ

করতে পারি। তাঁর নিজের রীতিও এটিই ছিল আর তিনি এই নির্দেশই দিয়ে রেখেছিলেন যে, একের অধিক তরকারি যেন ব্যবহার না করা হয়। একথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষিতে নিজের এক খুতবায় উল্লেখ করছেন। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা ছিল, (খাবারের জন্য) যেন একাধিক তরকারি না রাখা হয়। আর এর ওপর তিনি এত জোর দিতেন যে, কোন কোন সাহাবী এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছে যান। যেমন একবার হযরত উমর (রা.)-এর সামনে সিরকা এবং লবণ পরিবেশন করা হলে তিনি বলেন, দুই প্রকার খাবার কেন রাখা হলো, অথচ মহানবী (সা.) কেবল এক খাবার খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন? তাকে বলা হয়, অর্থাৎ মানুষ হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করে, এখানে দুটি নয়, বরং উভয়টি সম্মিলতভাবে এক তরকারি হয়, অর্থাৎ লবণ ও সিরকা। কিন্তু তিনি বলেন, না এখানে দুটি জিনিস রয়েছে। যদিও হযরত উমর (রা.)-এর এই কাজে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে বাড়াবাড়ির দিক রয়েছে বলে মনে হয়, সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছা এটি ছিল না, কিন্তু এই উদাহরণের মাধ্যমে এটি অবশ্যই জানা যায় যে, মুসলমানদের সরলতার প্রয়োজন দেখে এর ওপর তিনি কতটা জোর দিয়েছিলেন! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি আপনাদের কাছে হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় দাবি করি না এবং একথা বলি না যে, লবণ একটি তরকারি আর সিরকা আরেকটি। কিন্তু আমি আজ থেকে তিন বছরের জন্য (আপনাদের কাছে) এ দাবি রাখছি। এ সময়ের মধ্যে আমি এক বছর পর পর পুনরায় ঘোষণা করতে থাকব, যেন এই তিন বছরের মধ্যে ভয়ের অবস্থা পাল্টে গেলে নির্দেশাবলীও পরিবর্তন করা যায়। প্রত্যেক আহমদী, যে আমাদের সাথে এই যুদ্ধে যোগ দিতে চায় তাকে এই অঙ্গীকার করতে হবে যে, সে আজ থেকে কেবল একটি তরকারি খাবে, অর্থাৎ রুটি এবং তরকারি অথবা ভাত ও তরকারি। এগুলো দুটি জিনিস নয় বরং উভয়টি মিলে এক হবে। কিন্তু রুটির সাথে দুটি তরকারি বা ভাতের সাথে দুটি তরকারি খাওয়ার অনুমতি নেই। এটি সেই যুগের কথা যখন তিনি তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করেছিলেন আর তখন জামা'তের প্রয়োজনও ছিল। তাই তিনি এ আহ্বান জানান যে, নিজেদের ব্যয় হ্রাস করে চাঁদা প্রদান কর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই এই বাধ্যবাধকতা নেই, তথাপি অপচয় করা উচিত নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি কেউ রহমান খোদার বান্দা হতে চায় তাহলে তার জন্য এটিও শর্ত যে, সে যেন নিজ সম্পদ ব্যয় করার সময় দুটি বিষয় দৃষ্টিপটে রাখে। প্রথমত সে যেন তার সম্পদ অপচয় না করে। খাবারের উদ্দেশ্য কেবল বিলাসিতা ও স্বাদ উপভোগ করা হয় না বরং তা শক্তি, সামর্থ্য এবং দেহ ঠিক রাখার জন্য হয়ে থাকে। তার পরিধান সাজসজ্জার জন্য নয়, বরং দেহকে আবৃত করা এবং খোদা তা'লা তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা বজায় রাখার জন্য হয়ে থাকে। সাহাবীদের জীবনাচার থেকে বোঝা যায় যে, তারা এরূপই করতেন। যেমন হযরত উমর (রা.) একবার সিরিয়ায় যান। সেখানে কতিপয় সাহাবী রেশমী পোশাক পরিহিত ছিল। রেশমী পোশাকের অর্থ হলো সেসব পোশাক যাতে কিছুটা রেশমের মিশ্রণ থাকত, নতুবা (মিশ্রণমুক্ত) খাটি রেশমের কাপড় কোন রোগ-বালাই না থাকলে পুরুষদের জন্য পরিধান করা নিষিদ্ধ। তিনি, অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) নিজ সঙ্গীদের বলেন, তাদের প্রতি ধুলা ছুড়ে মার, অর্থাৎ তিনি এটি অপছন্দ করেন। আর তাদেরকে বলেন, তোমরা এখন এতটা আরামপ্রিয় হয়ে গিয়েছ যে, রেশমী পোশাক পরিধান করছ! তখন সেই সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন জামা উঠিয়ে দেখান। তখন জানা যায় যে, তিনি নীচে মোটা উলের শক্ত পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি হযরত উমরকে বলেন, আমরা রেশমী পোশাক পছন্দ করি– এ কারণে তা পরিধান করি নি বরং এজন্য পরেছি যে,

এই দেশের অধিবাসীদের রীতিই এমন। তারা শিশুকাল থেকেই এমন শাসকদের দেখে অভ্যস্ত যারা একান্ত আড়ম্বরতার সাথে জীবনযাপন করত। অতএব আমরাও তাদের প্রতি খেয়াল রেখে নিজেদের পোশাক দেশীয় রাজনীতির অধীনে পরিবর্তন করেছি, নতুবা আমাদের ওপর এগুলোর কোন প্রভাব নেই। অতএব সাহাবীদের কর্মপন্থা অপব্যয়ের অর্থ কী তা স্পষ্ট করে। এর অর্থ হলো, সম্পদ যেন এমনসব জিনিসের জন্য ব্যয় না করা হয় যেগুলো অপ্রয়োজনীয় আর যেগুলোর উদ্দেশ্য কেবল সাজসজ্জা ও বিলাসিতা হয়ে থাকে। মোটকথা খোদা তা'লা বলেন, রহমান খোদার বান্দা তারা হয়ে থাকে যারা নিজেদের ধনসম্পদের অপব্যয় করে না, যারা নিজেদের ধনসম্পদ লোকদেখানোর জন্য খরচ করে না, বরং উপকারার্থে এবং লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। তারা নিজ ধনসম্পদ এমন স্থানে ব্যয় করা থেকে যেন বিরত না থাকে যেখানে দেয়া আবশ্যক এবং তা যেন কল্যাণের কারণ হয়। এমনভাবে যেন সম্পদ ব্যয় না করে যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয় এবং ব্যয় করা হতে এমনভাবে বিরতও যেন না থাকে যে, বৈধ অধিকারও প্রদান করবে না। ইবাদুর রহমান তথা আল্লাহ্‌র বান্দাদের ধনসম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে এ দুটিই হলো শর্ত, কিন্তু অনেক মানুষ এমন রয়েছেন যারা হয় অপচয়ের দিকে চলে যায় নতুবা কৃপণতা অবলম্বন করে।

হযরত উমর (রা.) লোকদেখোনো এবং আড়ম্বরপূর্ণ পোশাকের এতটাই বিরোধী ছিলেন যে, পরাজিত শত্রুর জন্যও তিনি এটি পছন্দ করতেন না যে, সে এমন কোন পোশাক পরিধান করে তার সামনে আসবে যা আড়ম্বরপূর্ণ। যেমন পারস্য সেনাপতি হুরমুযান-এর ঘটনায় এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি তথাপি এখানেও বিষয় পরিষ্কার করার জন্য কিছুটা উল্লেখ করছি। 'তুসতার' বিজয়ের সময় পারস্য সেনাপতি হুরমুযান যখন অস্ত্রসমর্পণ করে নিজেকে মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করে আর তাকে হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে মদিনায় প্রেরণ করা হয়, তখন মদিনায় প্রবেশের পূর্বে যেসব মুসলমান তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তারা তাকে তার রেশমী পোশাক পরিয়ে দেয় যাতে হযরত উমর (রা.) এবং মুসলমানরা তার প্রকৃত রূপ দেখতে পারে। সে যখন হযরত উমর (রা.)-এর সামনে আসে তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ-ই কি হুরমুযান? মানুষ উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তখন হযরত উমর (রা.) তার প্রতি এবং তার পোশাকের প্রতি ভালোভাবে তাকান এবং বলেন, আমি আগুন থেকে আল্লাহ্ তা'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনা করি। কাফেলার লোকেরা বলে, এ হলো হুরমুযান, তার সাথে কথা বলে নিন। তিনি (রা.) বলেন, কখনোই না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও অলঙ্কারাদি খুলে ফেলবে। এ সবকিছু খুলে ফেলা হয় এবং তারপর হযরত উমর (রা.) তার সাথে কথা বলেন।

হযরত উমর (রা.)-এর বিনয় ও তাকওয়ার মান সম্পর্কে এ ঘটনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, উমর বিন খাত্তাবকে আমি কাঁধে করে একটি পানির মশক বহন করতে দেখেছি। আমি বলি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জন্য এটি শোভা পায় না। তিনি (রা.) বলেন, আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে যখন বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি দল আমার কাছে আসে তখন আমার হৃদয়ে নিজ বড়াইয়ের ধারণা জাগে। একারণে আমি স্বীয় বড়াই দূর করা আবশ্যক মনে করি যে, আমার মাঝে এটি কেন সৃষ্টি হলো। তাই আমি ভাবলাম, পানির মশক বহন করে নিয়ে যাব আর এটিকে এভাবে পিষ্ট করব।

হযরত ইয়াহিয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাতেব (রা.) নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, আমরা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে মক্কা থেকে কাফেলাসহ ফিরে আসছিলাম। আমরা যখন 'যাজনান' উপত্যকায় পৌঁছি, তখন লোকজন থেমে যায়। 'যাজনান' মক্কা থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী একটি স্থানের নাম। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, এই স্থানের সেই কথা আমার স্মৃতিতে অম্লান রয়েছে যখন আমি আমার পিতা খাত্তাবের উটে

বসা থাকতাম। তিনি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একবার আমি উটে করে কাঠ নিয়ে যেতাম এবং আরেকবার ঘাস নিয়ে যেতাম। বর্তমানে আমার অবস্থা হলো, আমার শাসিত অঞ্চলে মানুষ দূর-দূরান্তে সফর করে আর আমার ওপরে কেউ নেই, অর্থাৎ আমি এক বিশাল ও সুবিস্তৃত এলাকার শাসক যেখানে লোকেরা দূরদূরান্ত হতে সফর করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে আর পৃথিবীর কোন শাসক নেই যে আমার ওপর রাজত্ব করে। অতঃপর তিনি এই পঙক্তি পাঠ করেন,

لَا شَيْءَ فِيمَا تَرَى إِلَّا بَشَاشَتَه يَبْقَى الإِلَهُ وَيُودِى الْمَالُ وَالْوَلَدُ

অর্থাৎ, যা কিছুই তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তার কোন স্থায়িত্ব নেই, শুধুমাত্র এক সাময়িক আনন্দ ব্যতিরেকে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা-ই অবশিষ্ট থাকবে আর ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) হজ্জ থেকে ফেরার সময় একটি গাছের নিকট দাঁড়ান। হযরত হুযায়ফা (রা.), যিনি অকৃত্রিম সম্পর্ক রাখতেন, তিনি সাহস করে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি (রা.) বলেন, একটি সময় এমন ছিল যখন আমি আমার একটি উটকে চরাতাম এবং এই গাছের নীচে আমার পিতা আমাকে অনেক কঠিন বকাঝকা করেছিলেন। আর এখন এমন সময় এসেছে যে, শুধু উট নয় বরং লাখো মানুষ শুধুমাত্র আমার চোখের ইশারায় প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত রয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, একজন উটের রাখাল এক মহান বাদশাহ্ হয়ে গেছেন আর কেবল জাগতিক বাদশাহ্ নয়, বরং আধ্যাত্মিক জগতের (বাদশাহ্ও) বটে। তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা.), যিনি প্রাথমিক যুগে উট চরাতেন। একবার তিনি (রা.) হজ্জ করতে যান। তখন পথিমধ্যে একটি স্থানে দাঁড়িয়ে যান। রোদ ছিল অত্যন্ত তীব্র, যার ফলে মানুষের খুবই কষ্ট হয়, কিন্তু কারো এটি জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না যে, আপনি এখানে কেন দাঁড়িয়েছেন? অবশেষে এক সাহবীকে, যিনি হযরত উমর (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং যাকে তিনি (রা.) নৈরাজ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, লোকজন বলে যে, আপনি তাঁকে অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করুন যে, এখানে কেন দাঁড়িয়েছেন? তিনি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, সামনে অগ্রসর হোন, এখানে কেন দাঁড়িয়ে গেছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি এখানে এজন্য দাঁড়িয়েছি যে, একবার আমি উট চরানোর কারণে ক্লান্ত হয়ে এই গাছের নীচে শুয়ে পড়েছিলাম; আমার পিতা আসেন এবং আমাকে (এই বলে) প্রহার করেন যে, তোকে কি আমি সেখানে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকার জন্য পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং এক সময় এই ছিল আমার অবস্থা, কিন্তু আমি রসূলে করীম (সা.)-কে গ্রহণ করেছি, ফলে খোদা তা'লা আমাকে এই পদমর্যাদা দান করেছেন যে, আজ আমি যদি লাখো মানুষকে আহ্বান জানাই তবে আমার স্থলে (তারা) প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছে। এই ঘটনা এবং এরূপ আরো বহু ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীদের অবস্থা কেমন ছিল এবং রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ফলে তাদের অবস্থায় কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল! তাঁরা সেই পদমর্যাদা ও জ্ঞান লাভ করেছিলেন যা অন্য কারো ছিল না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনা আমি এজন্য শুনিয়েছি যে, দেখ! একজন উটের রাখালকে ধর্মীয় ও পার্থিব জগতের এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে যা কারো বোধগম্য নয়। একদিকে উট অথবা বকরি চরানোর কথা চিন্তা করে দেখ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে এর দূরতম সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না আর অন্যদিকে এ বিষয়ে অভিনিবেশ কর যে, আজও যখন কিনা ইউরোপের লোকজন রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যথেষ্ঠ অবগত ও অবহিত (তারাও) হযরত উমর (রা.) কর্তৃক প্রণীত রাষ্ট্রনীতিকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

একজন রাখাল এবং রাজত্বের মধ্যে পারস্পরিক কী সম্পর্ক থাকতে পারে? কিন্তু দেখ! তিনি সেসব কাজ করেছেন যার ফলে আজ পৃথিবীবাসী তাঁর সামনে মস্তক অবনত করে এবং তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশংসা করে। অতঃপর দেখ! হযরত আবু বকর (রা.) একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু আজ পৃথিবীবাসী বিস্মিত যে, তিনি (রা.) এরূপ বোধবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এবং চিন্তাশক্তি কোথা হতে লাভ করেছেন! আমি বলছি, তিনি (রা.) সবকিছু কুরআন শরীফ হতে লাভ করেছেন। তিনি (রা.) কুরআন শরীফের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করেছেন, এজন্য তিনি সেই সমস্ত কিছু জানতে পেরেছেন যা সম্পর্কে সারা পৃথিবী অজ্ঞ ছিল। কেননা কুরআন শরীফ এমন এক অস্ত্র, যখন এর দ্বারা হৃদয়কে পরিস্কার-পরিপাটি করা হয় তখন (হৃদয়) এমন স্বচ্ছ হয়ে যায় যে, জগতের সকল জ্ঞান তখন তাতে স্থান করে নেয় এবং মানুষের জন্য এমন এক দ্বার উন্মুক্ত হয় যে, এরপর তার হৃদয়ে যে জ্ঞান অবতীর্ণ করা হয় তাতে কেউ বাঁধ সাধতে চাইলেও তা বাধাগ্রস্ত হতে পারে না। অতএব প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যক, পবিত্র কুরআন পড়া এবং (এর প্রতি) গভীর মনোনিবেশের চেষ্টা করা।

হযরত উমর (রা.)-এর বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, জুবায়ের বিন নুফায়ের বলেন, একটি জামা'ত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা কোন ব্যক্তিকে আপনার তুলনায় অধিক ন্যায়পরায়ণ, সত্যভাষী এবং মুনাফিকদের প্রতি এত কঠোরতা প্রদর্শনকারী দেখি নি। নিঃসন্দেহে আপনি মহানবী (সা.)-এর পর মানুষের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। অওফ বিন মালেক উক্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি মিথ্যা বলেছ। আমরা নিশ্চিতভাবে মহানবী (সা.)-এর পর তাঁর [অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)-এর] তুলনায় উত্তম মানুষকেও দেখেছি। তখন হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে অওফ! সেই ব্যক্তি কে? তখন তিনি উত্তরে বলেন, 'হযরত আবু বকর'। হযরত উমর (রা.) [হযরত অওফ'কে সম্বোধন করে] বলেন, তুমি সত্য বলেছ এবং ঐ ব্যক্তিকে বলেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্‌র শপথ! আবু বকর কস্তুরির সৌরভের চেয়ে অধিক পবিত্র এবং আমি আমাদের গৃহপালিত উটের চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা হযরত উমর এবং হযরত আবু বকরের মাঝে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিতণ্ডা হয়। এই বিতণ্ডা চরমে পৌঁছে যায়। হযরত উমর (রা.) কিছুটা রাগী প্রকৃতির ছিলেন তাই হযরত আবু বকর (রা.) সেই স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেন, যেন বাগ্‌বিতণ্ডা অযথা প্রলম্বিত না হয়। হযরত আবু বকর (রা.) বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে হযরত উমর (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর জামা টেনে ধরে বলেন, আমার কথার উত্তর দিয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.) জামা ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে জামা কিছুটা ছিঁড়ে যায়। তিনি (রা.) সেখান থেকে সরাসরি বাড়িতে চলে যান। কিন্তু হযরত উমর (রা.) সন্দিহান হন যে, হযরত আবু বকর (রা.) হয়ত মহানবী (সা.)-এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেছেন। তাই তিনি তার পেছনে যান যেন তিনিও মহানবী (সা.)-এর কাছে তার অবস্থান তুলে ধরতে পারেন, কিন্তু পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে হযরত উমর (রা.) তখনও ভাবেন যে, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নালিশ করতে গেছেন। তাই তিনিও সরাসরি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। গিয়ে দেখেন হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে নেই, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে যেহেতু অনুশোচনা সৃষ্টি হয়েছিল তাই মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মস্তবড় ভুল করে ফেলেছি, আমি আবু বকরের সাথে কঠোর আচরণ করে ফেলেছি। হযরত আবু বকরের কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। হযরত উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন তখন হযরত আবু বকরের কাছে কেউ

একজন গিয়ে বলে, হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) মনে মনে ভাবেন, আমার নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করতে সেখানে যাওয়া উচিত পাছে একমুখি কথা হয়, (আমিও যাই যেন আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারি)। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হন তখন হযরত উমর (রা.) বলছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ভুল আমার-ই হয়েছে, আমিই আবু বকরের সাথে বিতণ্ডা করেছি এবং আমার কারণে তাঁর জামা ছিঁড়ে গেছে। এ কথা শোনার পর মহানবী (সা.)-এর চেহারায় রাগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের কী হয়েছে? যখন সারা জগৎ আমার অস্বীকার করত, যখন তোমরাও আমার বিরোধী ছিলে তখন এই আবু বকরই ছিল যে আমার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সকল অর্থে আমাকে সাহায্য করেছে। এরপর আক্ষেপের সাথে বলেন, এখনও কি তোমরা আমাকে এবং আবু বকরকে পরিত্রাণ দিবে না? মহানবী (সা.) যখন এ কথা বলছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে প্রবেশ করেন। [এটিই হলো সত্যিকারের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কোন দোষ ছিল না, বরং সব দোষ উমরের– একথা বলার পরিবর্তে] হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে প্রবেশ করে যখন দেখেন যে, মহানবী (সা.) অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, তখন তিনি নিষ্ঠাবান প্রেমিক হিসেবে সহ্য করতে পারেন নি যে, 'আমার কারণে মহানবী (সা.) কষ্ট পাবেন'। তাই হযরত আবু বকর (রা.) আসতেই মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! উমরের কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার।

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি মানুষের সাথে নারীদের কৃত্রিম গর্ভপাতের ক্ষেত্রে এর রক্তপণ কি হবে– সে সম্পর্কে পরামর্শ করেন। মুগীরা বলেন, মহানবী (সা.) এরূপ ক্ষেত্রে একজন দাস বা দাসীর মূল্য রক্তপণরূপে প্রদান করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এমন কাউকে নিয়ে আস যে তোমার একথার সাক্ষী হবে। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা সাক্ষ্য দেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত ছিলেন যখন তিনি (সা.) এরূপই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোন নারীর গর্ভপাত করানো হলে তবে এর জন্য রক্তপণ দেয়া আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি সেই অবিচার করেছে সে রক্তপণস্বরূপ একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী মুক্ত করবে।

হযরত আবু সাঈদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু মূসা আশআরী (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কাছে তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি সালাম দেয়ার পর বলেন আমি কি ভেতরে আসতে পারি। হযরত উমর (রা.) মনে মনে বলেন, এখনতো মাত্র একবার অনুমতি চেয়েছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় তিনি বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? উমর (রা.) মনে মনে উত্তর দেন এবং বলেন, এখন তো দু'বার অনুমতি চেয়েছ। আরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি পুনরায় সালাম দিয়ে বলেন, আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি? তিন বার অনুমতি চাওয়ার পর আবু মূসা আশআরী ফিরে যান। অর্থাৎ তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পরও হযরত উমরের সাড়া না পেয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর (রা.) প্রহরীকে জিজ্ঞেস করেন, আবু মূসা কোথায়? প্রহরী বলে, তিনি ফিরে যাচ্ছেন। উমর (রা.) বলেন, তাকে আমার কাছে ডেকে আন। অতঃপর তিনি যখন তাঁর কাছে আসেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, ঘটনা কী? উত্তরে তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পালন করেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, কোন্ সুন্নত? আল্লাহ্‌র কসম! এটি সুন্নত হওয়া সম্পর্কে তোমাকে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, নয়তো আমি তোমার সাথে কঠোর আচরণ করব। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে আসেন। তখন আমরা আনসারদের একটি দলের সাথে ছিলাম। আবু মূসা আশআরী বলেন, হে আনসারদের

দল! তোমরা কি অন্যান্য লোকদের চাইতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস অধিক অবগত নও? রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি এ কথা বলেন নি যে, **'আল-ইসতে'যানু সালাস'** অর্থাৎ অনুমতি তিন বার প্রার্থনা করা যায়। এতে যদি তোমাদের আনুমতি দেয়া হয় তবে ঘরে প্রবেশ করবে আর যদি অনুমতি না দেয়া হয় তবে ফিরে যাবে। এটি শুনে লোকেরা তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি আমার মাথা আবু মূসা আশআরীর দিকে উঁচিয়ে বললাম, এ ব্যাপারে আপনি যে শাস্তিই পাবেন আমিও তার অংশীদার হব। তিনি বলেন, ঠিক আছে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সঠিক বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি অর্থাৎ আবু সাঈদ হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসেন এবং তাকে এ হাদীস অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, ঠিক আছে। আমি এ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলাম না, এখন আমি এটি জানতে পারলাম।

সহীহ্ মুসলিম-এ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং আরো কিছু লোকসহ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে যান, কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হয়। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, পাছে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমরা শংকিত হই এবং উঠে দাঁড়াই। আমি সর্ব প্রথম চিন্তিত হই এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনুসন্ধান করতে বাইরে বেরিয়ে পড়ি এবং বনু নাযর গোত্রের এক আনসারের একটি বাগানের কাছে আসি। আমি বাগানের চারপাশে দরজা খুঁজতে থাকি, কিন্তু আমি দরজা খুঁজে পাইনি। পুনরায় দেখি যে, বাহিরের একটি কুয়া থেকে পানির একটি বড় নালা বাগানের ভিতরে গিয়েছে। আমি শিয়ালের মতো কুঁজো হয়ে নালা দিয়ে বাগানে প্রবেশ করি এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আবু হুরায়রা? আমি বলি, হে আল্লাহ্র রসূল! জ্বী। তিনি (সা.) বলেন, বিষয় কী? আমি বলি, আপনি আমাদের মাঝে ছিলেন। এরপর আপনি উঠে চলে আসেন, কিন্তু আপনি ফিরতে দেরি করলে আমরা শঙ্কিত হই যে, পাছে আপনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সর্বপ্রথম আমি চিন্তিত হই এবং এই বাগানের কাছে আসি। এরপর শিয়ালের মতো কুঁজো হয়ে ভিতরে প্রবেশ করি আর অন্যরা বাইরে আছে। তিনি (সা.) আমাকে তার জুতো দিয়ে বলেন, হে আবু হুরায়রা! আমার এই জুতো জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের বাইরে যার সাথেই তোমার দেখা হয় এবং সে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আন্তরিকভাবে এ বিশ্বাস রাখে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি (রা.) বলেন, আমি যখন ফিরে আসি তখন সর্বপ্রথম আমার সাথে উমর (রা.)-এর দেখা হয়। তিনি (রা.) বলেন, হে আবু হুরায়রা! এই জুতা কার? আমি বলি, এগুলো মহানবী (সা.)-এর জুতা আর মহানবী (সা.) চিহ্নস্বরূপ আমাকে এগুলো দিয়েছেন। আর এই দু'টিসহ আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন যে, যার সাথেই আমার সাক্ষাৎ হবে সে যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আন্তরিকভাবে এতে বিশ্বাস রাখে তাহলে আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) রাগে সজোরে আমার বুকে চাপড় মারেন আর আমি মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে যাই। তিনি (রা.) বলেন, হে আবু হুরায়রা ফিরে যাও। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। তিনি (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে যাই, আমার কান্নার উপক্রম হয়। ইতোমধ্যে হযরত উমর (রা.) আমার পিছনে পিছনে সেখানে পৌঁছেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু হুরায়রা তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, আমার সাথে হযরত উমরের দেখা হয়েছিল আর আপনি আমাকে যা কিছু বলার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাকে আমি তা বলি। তখন হযরত উমর (রা.) আমার বুকের ওপর সজোরে চাপড় মারেন আর আমি চিৎ হয়ে পড়ে যাই। এরপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও। মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! তুমি এমনটি কেন করলে?

হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। আপনি কি আপনার জুতাসহ আবু হুরায়রাকে এটি বলার জন্য প্রেরণ করেছিলেন যে, যার সাথে তার দেখা হবে এবং সে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর সে যদি হৃদয় থেকে এটি বিশ্বাস করে তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) বলেন, দয়া করে এমনটি করবেন না, কেননা আমার আশঙ্কা হয় যে, পাছে মানুষ এর ওপর নির্ভর করে বসে যাবে। তাদেরকে আমল করতে দিন, এটিই ভালো হবে, নেক কর্মের নির্দেশাবলী মেনে চলতে দিন, যেন তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারে। অন্যথায় তারা শুধুমাত্র এই বিষয় নিয়ে বসে থাকবে যে, জান্নাত লাভের জন্য **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'** বলাই যথেষ্ট। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, তাই হোক। হযরত উমর অত্যন্ত সাবধান প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-কে ভয় পেয়ে শয়তানও পালাতো। এই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। সহীহ বুখারীতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে,

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা) মহানবী (সা.)-এর কাছে ভিতরে আসার অনুমতি চান। তখন কিছু কুরায়েশ নারী তাঁর (সা.) কাছে বসে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। তারা তাঁর (সা.) কাছে সমধিক হাত খরচ চাচ্ছিলেন। তাদের গলার স্বর মহানবী (সা.)-এর স্বরের চেয়ে উঁচু ছিল। যখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) ভিতরে আসার অনুমতি চান, তখন তারা দ্রুত উঠে পর্দার আড়ালে চলে যায়। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) হযরত উমরকে ভিতরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। হযরত উমর আসেন আর মহানবী (সা.) হাসছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌ আপনাকে সর্বদা হাসিখুশি রাখুন। মহানবী (সা.) বলেন, সেসব মহিলার আচরণে আমি বিস্মিত যারা আমার কাছে ছিল। আপনার আওয়াজ শোনামাত্রই তারা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অথচ আপনাকেই তো বেশি ভয় পাওয়া উচিত। এরপর হযরত উমর (রা.) বলেন, হে নিজেদের প্রাণের শত্রুরা! উচ্চস্বরে মহিলাদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, তোমরা কি আমাকে ভয় কর আর রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে ভয় কর না? তারা বলে, জ্বী! আপনি তো একজন কঠোর প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয়ের মানুষ, কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তো তেমন নন। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র শুন! সেই সত্তার কসম যার হতে আমার প্রাণ! যখনই শয়তান তোমাকে পথ চলতে দেখেছে তখন অবশ্যই সে তার সেই পথ পরিত্যাগ করে অন্য পথ ধরেছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বসেছিলেন, এমন সময় আমরা কোলাহল ও শিশুদের আওয়াজও শুনতে পাই। (এটি শুনে) রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) দাঁড়িয়ে যান এবং (দেখেন) সেখানে একজন ইথিওপিয়ান নারী নৃত্য পরিবেশন করছিল আর শিশুরা তার চারপাশে ভিড় করেছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, হে আয়েশা এসে দেখ! তখন আমি এসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর কাঁধের ওপর আমার চিবুক রেখে দেখতে থাকি। আমার চিবুক তাঁর মাথা ও কাঁধের মাঝখানে ছিল। (কিছুক্ষণ) পর তিনি (সা.) আমাকে বলেন, তোমার কি মন ভরে নি? উত্তরে আমি বলি, এখনও না, বরং আমি দেখতে চাই আপনি আমাকে কতটা মূল্যায়ন করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) আসার পর মানুষ সেই মহিলার কাছ থেকে কেটে পড়ে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমার অভিজ্ঞতা হলো, জীন ও মানুষের (মধ্যকার) শয়তান উমরকে দেখে পালায়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে আসি।

হযরত বুরায়দা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কোন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। (এরপর) যখন সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন তখন একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাসী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মানত করেছিলাম যে,

আপনাকে যদি আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন তাহলে আমি আপনার সামনে ঢোল বাজিয়ে গান গাইব। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তুমি মানত করে থাকলে বাজাও অন্যথায় (এ কাজ কোরো) না। অতএব সেই নারী ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.) আসেন, সে ঢোল বাজাতে থাকে। হযরত আলী (রা.) এলেও সে ঢোল বাজাতে থাকে। এরপর হযরত উসমান (রা.) এলেও সে ঢোল বাজাতে থাকে। কিন্তু যখন হযরত উমর (রা.) আসেন তখন সে ঢোলটি রেখে তার ওপর বসে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হে উমর! শয়তানও তোমাকে দেখে ভয় করে। আমি বসে ছিলাম, সে ঢোল বাজাতে থাকে, এরপর আবু বকর আসে, তবুও সে ঢোল বাজানো অব্যাহত রাখে, আলী এলেও ঢোল বাজানো অব্যাহত রাখে, আর উসমান এলেও সে ঢোল বাজাতে থাকে, কিন্তু হে উমর! তুমি এলে সে ঢোলটি রেখে দেয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেছিলেন, শয়তান যদি কোন পথে তোমাকে দেখতে পায় তাহলে সে অন্য পথ অবলম্বন করে আর তোমাকে ভয় পায়। এ দলিল থেকে প্রমাণিত হয় যে, শয়তান হযরত উমরের কাছ থেকে এক নপুংশক লাঞ্ছিত ব্যক্তির ন্যায় পলায়ন করে।

হযরত উমর (রা.)-এর জিহ্বা এবং হৃদয়ে সত্য ও প্রশান্তি সম্পর্কে একবার মহানবী (সা.) বলেছেন, (হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,) আল্লাহ্ সত্যকে উমরের মুখ ও হৃদয়ে জারি করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর ভাই ফযল (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, উমর বিন খাত্তাব আমার সাথে থাকে যেখানে আমি পছন্দ করি এবং আমি তার সাথে থাকি যেখানে সে পছন্দ করে। আর আমার পর উমর বিন খাত্তাব যেখানেই থাকবে সত্য তার সাথে থাকবে।

হযরত আলী (রা) বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, হযরত উমর (রা.)-এর মুখ ও হৃদয় থেকে প্রশান্তি নিঃসৃত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর এক স্ত্রীকে বলেন, আমার জন্য সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত কর। তিনি সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, আমার জন্য ছাতু অথবা শস্যদানা জাতীয় খাবার ভেজে প্রস্তুত করে দাও। সে যুগে এ ধরনের খাদ্যই পাওয়া যেত। অতএব তিনি (রা.) শস্যদানা থেকে মাটি প্রভৃতি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার মেয়ের বাড়ি এসে এসব প্রস্তুতি দেখার পর জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা! কী হচ্ছে? রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি কোন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, সফরের প্রস্তুতিই মনে হচ্ছে। মহানবী (সা.) সফরের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। তিনি (রা.) বলেন, কোন যুদ্ধে যেতে চাচ্ছেন কি? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কিছু জানি না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার সফরের জন্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত কর, তাই আমরা এসব করছি। দু'তিন দিন পর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-কে ডেকে বলেন, আপনারা জানেন যে, খুযাআ গোত্রের লোকজন এসে এই ঘটনা ঘটার সংবাদ দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই আমাকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেছিলেন যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অর্থাৎ মক্কাবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অথচ তাদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে। এখন যদি আমরা ভয় পেয়ে যাই এবং মক্কাবাসীর সাহসিকতা ও শক্তিসামর্থ্য দেখে তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত না হই তাহলে এটি হবে ঈমান পরিপন্থি কাজ। কাজেই আমাদের (তাদেরকে দমনের জন্য) সেখানে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে তোমাদের কী অভিমত? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আর তারা আপনার জাতির

লোক! এ কথার অর্থ ছিল, আপনি কি তাহলে আপনার জাতির লোকদের হত্যা করবেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, আমরা আমাদের জাতির লোকদের নয় বরং অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের হত্যা করব। এরপর হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ্! আমি তো প্রতিদিনই দোয়া করতাম যেন এমন দিন ভাগ্যে জুটে যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুরক্ষায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর খুবই কোমল স্বভাবের মানুষ, কিন্তু সত্য কথা উমরের মুখ থেকেই বেশি নিঃসৃত হয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, প্রস্তুতি নাও। অতঃপর তিনি (সা.) আশপাশের গোত্রগুলোর মাঝে এই ঘোষণা করিয়ে দেন যে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে তারা যেন রমজানের প্রাথমিক দিনগুলোতে মদিনায় সমবেত হয়। অতএব সেনা সমাবেশ ঘটতে থাকে আর এভাবে কয়েক হাজার লোক সম্বলিত সেনা বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, ইল্লীঈনবাসীদের মধ্যে থেকে কোন এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের দিকে উঁকি দিলে তাঁর চেহারার কারণে (গোটা) জান্নাত আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেন তা একটি দ্যুতিময় নক্ষত্র। হযরত আবু বকর এবং উমর তাদের অন্তর্ভুক্ত আর তারা দুজন কতই না উত্তম মানুষ!

আবু উসমানের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আমর বিন আস (রা.)-কে যাতুস সালাসিল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। এটি মদিনা থেকে এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। (এই দূরত্ব ছিল) সেই যুগের সফরের রীতি অনুসারে। এটি ওয়াদিউল কুরা ছেড়ে জুযাম গোত্রের অঞ্চলে অবস্থিত একটি কূপের নাম। হযরত আমর (রা.) বলেন, আমি যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে আসি তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, মানুষের মাঝে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি (সা.) বলেন, আয়েশা। আমি আবার বলি, পুরুষের মধ্যে কে আপনার দৃষ্টিতে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি (সা.) বলেন, এই আয়েশার পিতা। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করি, এরপর কে? তিনি (সা.) বলেন, উমর। এরপর তিনি (সা.) আরো কয়েকজন পুরুষের নাম উল্লেখ করেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস, মুহাজের ও আনসার সাহাবীদের বসে থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের কাছে আসতেন। তাদের মাঝে আবু বকর এবং উমর (রা.)ও থাকতেন, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে আবু বকর এবং উমর (রা.) ছাড়া আর কেউই তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। তারা উভয়ে তাঁকে দেখে মুচকি হাসতেন আর তিনিও তাদেরকে দেখে মুচকি হাসতেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন বের হন আর তিনি (সা.) এবং হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) মসজিদে প্রবেশ করেন। তাদের একজন তাঁর ডানদিকে এবং অন্যজন বামদিকে ছিলেন আর তিনি (সা.) তাদের উভয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন। (এ অবস্থায়) তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমরা এভাবেই উত্থিত হব।

আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব হতে বর্ণিত, রসূলে করীম (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-কে দেখে বলেন, এরা দুজন হলো কান এবং চোখ।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর সর্বোত্তম মানুষ! তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি যদি এমন কথা বলেন তাহলে শুনে রাখুন! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, উমরের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে সূর্য দেখে নি।

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি হব যাকে কবর থেকে উত্থিত করা হবে। এরপর আবু বকর (রা.) আর তারপর উমর (রা.)। এরপর আমি বাকীবাসীদের কাছে আসব তখন তারা আমার সাথে উত্থিত হবে। এরপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করব যতক্ষণ না হারামাইন তথা মক্কা ও মদিনার মাঝখানে উত্থিত হই।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের কাছে জান্নাতবাসীদের একজন আসছেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) আসেন। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের নিকট জান্নাতবাসীদের একজন আসছেন। তখন হযরত উমর (রা.) আসেন।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেন, নবী ও রসূলগণ ব্যতীত জান্নাতের পূর্বাপর সকল বয়োজ্যেষ্ঠদের সর্দার হচ্ছেন এই দুজন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমার পর তোমরা যুগপৎ আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য ঊর্ধ্বলোকবাসীদের মধ্য থেকে দুজন সাহায্যকারী এবং জগদ্বাসীদের মধ্য থেকেও দুজন সাহায্যকারী হয়ে থাকেন। ঊর্ধ্বলোকবাসীদের মধ্যে আমার দুজন সাহায্যকারী হলেন, জিব্রাঈল ও মীকাঈল আর জগদ্বাসীর মধ্যে আমার দু'জন সাহায্যকারী হলো, আবু বকর এবং উমর।

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা মহানবী (সা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, আমি জানি না যে, তোমাদের মাঝে আমি কতদিন থাকব। সুতরাং তোমরা এই দু'জনের অনুসরণ করবে যারা আমার পর (আমার স্থলাভিষিক্ত) হবে। (একথা বলে) তিনি (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-এর দিকে ইশারা করেন।

হযরত আবু বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে? জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করে, আমি দেখেছি। মনে হচ্ছিল একটি পাল্লা আকাশ থেকে নেমে এসেছে আর আপনাকে ও হযরত আবু বকরকে তাতে মাপা হয়েছে। আপনি হযরত আবু বকর থেকে ভারী সাব্যস্ত হন। এরপর হযরত আবু বকর ও হযরত উমরকে মাপা হয়। এতে হযরত আবু বকর ভারী সাব্যস্ত হন। এরপর হযরত উমর ও হযরত উসমানকে ওজন করা হয়, তাতে হযরত উমর ভারী সাব্যস্ত হন। এরপর সেই দাড়িপাল্লা উঠিয়ে নেয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর পবিত্র চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পাই। অপর একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) উক্ত স্বপ্ন শোনার পর বলেন, এটি নবুয়্যতের খিলাফত, এরপর আল্লাহ্ যাকে চাইবেন রাজত্ব দান করবেন।

আব্দে খায়ের বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিয়ে বলেন, হে লোকসকল! আমি কি তোমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর পর এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কে বলবো না? লোকেরা বলে, কেন নয়? হযরত আলী (রা.) বলেন, তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলেন, হে লোকসকল! আমি কি তোমাদেরকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ সম্পর্কে বলবো না? তিনি হলেন, হযরত উমর (রা.)। আবু জুহায়ফা বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, এই উম্মতে মহানবী (সা.)-এর পর সর্বোত্তম হলেন, হযরত আবু বকর (রা.), এরপর হযরত উমর (রা.)।

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে, আগামীতেও কিছুসময় হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এখন নামাযের পর আমি কয়েকটি জানাযা পড়াব, সেগুলোর উল্লেখ করে দিচ্ছি।

প্রথমে যার উল্লেখ করব তিনি হলেন, পেশাওয়ার নিবাসী নাসির আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ মোকাররম কামরান আহমদ সাহেব। গত ০৯ নভেম্বর তারিখে বিরুদ্ধবাদীরা তার অফিসে ঢুকে তাকে গুলি করে শহীদ করে দেয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। শহীদের বয়স ছিল ৪৪ বছর। তিনি পেশাওয়ারে একজন আহমদী জনাব শফীকুর রহমান সাহেবের কারখানায় একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একজন সশস্ত্র ব্যক্তি অফিসে প্রবেশ করে এবং গুলি করে। তার শরীরে চারটি গুলি লাগে আর তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার পর হন্তারক পালিয়ে যায়। মরহুম শহীদের বংশে তার পিতা জনাব নাসির আহমদ সাহেবের নানা কাদিয়ানের নিকটস্থ ভেনি বাঙ্গড়ের ফতেহ দীন সাহেবের পুত্র হযরত নবী বখশ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে, যিনি ১৯০২ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করেছিলেন। শহীদ মরহুম কিছুদিন পূর্বে একটি দোকান নিয়ে তার ভাইয়ের সাথে একটি অফিস বানিয়েছিলেন। দোকানের মালিক শুধুমাত্র আহমদী হওয়ার কারণে একদিনের নোটিশে দোকান খালি করিয়ে নেয় আর এরপর সেই চকের বা চত্তরের নাম খতমে নবুওয়্যত চক রাখা হয়। পাশেই আরেকটি দোকান নিলে এবারও বিরুদ্ধবাদীরা মিছিল বের করে সেই দোকানও খালি করিয়ে নেয়। তাদের ঘরের কাছেই গত অক্টোবরে একটি জনসভা করা হয় এবং এতে আহদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে চরম উস্কানিমূলক বিভিন্ন বক্তৃতা করা হয়। তিনি বলেন, অত্র অঞ্চলে এত বড় জনসভা আমরা পূর্বে কখনো দেখি নি। সেই অঞ্চলে ভয়াবহ ঘৃণা ও বিদ্বেষের আবহ তৈরি হয়ে যায়। শহীদ মরহুম কয়েক বছর ধরে একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে একাউন্ট সম্পর্কিত বিষয়াদির দেখাশুনা করতেন। বিরোধিতার কারণে তিনি সেখানে কাজ করতে অপারগতা জানালে তারা বলে, আপনার আচরণ এবং সততা এমন যে, আমরা আপনাকে ছাড়তে পারব না। আপনি কয়েক মিনিটের জন্য হলেও আমাদের এখানে আসবেন। তারা যখন তার শাহাদত বরণের সংবাদ পায় তখন তারা খুবই ব্যথিত ছিল। শহীদ মরহুম অগণিত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তার পিতা বলেন, রাতে দেরিতে আসায় একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি এত রাত করে ঘরে ফিরেছ, কারণ কী? তখন তিনি বলেন,

অমুক আহমদী বিরোধী, বরং বলা যায় আহমদীয়াতের শত্রু পরিবারের এক মহিলার রক্তের প্রয়োজন ছিল, সেই বিরুদ্ধবাদীর পরিবারের কোন মহিলার রক্তের প্রয়োজন ছিল, তাকে রক্তদান করে আসলাম। আর রক্ত দিয়েছি কারণ, এরা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ও অসহায়। তারা তাদের কাজ করছে আর আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করছি। সর্বদা মানবসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। জামা'তের কর্মকাণ্ডে ও ডিউটিতে সর্বাগ্রে উপস্থিত থাকতেন এবং তিনি সবসময় স্পর্শকাতর বা আশঙ্কাপূর্ণ জায়গায় নিজে দাঁড়াতেন। তাকে হিজরত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলে তিনি বলতেন, আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে দুর্বল আহমদীদের সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। বিভিন্ন চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য মর্যাদা রাখতেন এবং বিভিন্ন চাঁদার তাহরীকে সর্বাগ্রে চাঁদা আদায় করতেন। বারো-তেরো বছর বয়সে একবার মুবাহালার প্যাম্ফলেট বিতরণের কারণে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে হাজতে আটকে রাখে। পরের দিন তিনি মুক্তি লাভ করেন। শাহাদাতের ঘটনার দু'দিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, একজন বুযুর্গ মহিলা তার ঘর পরিষ্কার করছে আর বলছে যে, খলীফা রাবে (রাহে.) আসবেন। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ পরই হুযূর (রাহে.) এসে শহীদ

মরহুমের হাত নিজ হাতে নিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরে বলেন, আমরা এক সাথে থাকব আর তোমাকে আমার সাথেই থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নম্র স্বভাবসম্পন্ন এবং এলাকার সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভদ্র, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, খিলাফতের প্রতি সিমাহীন ভালোবাসা পোষণকারী ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে পরিবারে পিতামাতা, পিতা নাসির আহমদ সাহেব, মাতা, স্ত্রী এবং তেরো, এগারো ও আট বছরের তিন সন্তান রেখে গেছেন। মহান আল্লাহ্ এ সন্তানদের হেফাযতকারী ও সাহায্যকারী হোন, তাদের মনোবল দৃঢ় করার এবং ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করুন। তার প্রতিও দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর মা-ও অসুস্থ রয়েছেন, তার জন্যও দোয়া করুন। তিনি ক্যান্সারের রোগী, আল্লাহ্ তার প্রতি কৃপা করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, ডাক্তার মির্যা নুবায়ের আহমদ ও তার স্ত্রী আয়েশা আম্বর সৈয়দ সাহেবার। আমেরিকার মালাওয়াকিতে এক দুর্ঘটনায় তারা দু'জন ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ডাক্তার মির্যা নুবায়ের আহমদ সাহেবের বয়স ছিল ৩৫ বছর। মরহুমের প্রপিতামহ হলেন ডেপুটি মিয়া মুহাম্মদ শরীফ আহমদ সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। আর মরহুমের দাদী মাস্টার আব্দুর রহমান সাহেব (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। তার প্রমাতামহও সাহাবী ছিলেন। তাদের বংশে অনেক সাহাবী ছিলেন। ২০১২ সালে তিনি স্থানান্তরিত হয়ে আমেরিকায় চলে যান। সতেরো বছর বয়সে তিনি নেযামে ওসীয়্যতে অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক লাভ করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। আর বলা হয় যে, মরহুম মালাওয়াকির মসজিদের জন্য নতুন ভবন ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় জামা'তের সর্বাধিক অনুদান প্রদানকারীদের অন্যতম ছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তার পিতা মির্যা নাসির আহমদ সাহেব, যিনি বর্তমানে ইসলামাবাদ জামা'তের উমুরে আম্মা'র দায়িত্ব পালন করছেন, তার মা, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইসলামাবাদের রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট, বোন নাদিয়া ও দুই ভাই রয়েছেন। আর তার স্ত্রী আয়েশা আম্বর যিনি তার সাথেই মৃত্যু বরণ করেন, ইনি জাপানের সৈয়দ সুজাআত শাহ্ সাহেবের কন্যা ছিলেন। এছাড়া তিনি বর্তমানে জাপানে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলা সৈয়দ ইব্রাহীম সাহেবের বোন ছিলেন। তাদের বংশে ফাগলার সৈয়দ আবদুর রহীম শাহ সাহেবের মাধ্যমে ১৯৩০ সালে আহমদীয়াত প্রবেশ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে তিনি বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি যেমনটি বলেছি যে, স্বামীর সাথেই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে দু'দিন পর আয়েশা আম্বরীনের মৃত্যু হয়। মরহুমা এম.টি.এ. ইন্টারন্যাশনালের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আর আমার খুতবাসমূহের সরাসরি জাপানী ভাষায় অনুবাদ করতেন। আর সেই সাথে জাপানি ভাষায় সাব-টাইটেলের কাজও করতেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি বাবা সৈয়্যদ সাজ্জাদ সাহেব ও তার মা সৈয়্যদা দুর্‌রে সামীন সৈয়্যদ সাহেবা, এছাড়া তার তিন ভাই এবং একজন বোনকে রেখে গেছেন। তার এক ভাই ইব্রাহীম সাহেব, যিনি বর্তমানে জাপানে মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি বলেন, সে জামা'তের অনেক কাজে আমাকে সাহায্য করত। 'লেকচার লাহোর' ও 'হামারা খুদা' পুস্তক জাপানী ভাষায় অনুবাদের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছে আর সে এতো ভালো অনুবাদ করতো যে, আমি সর্বদা অবাক হয়ে যেতাম যে, ফার্মেসী বিভাগে পড়েও সে এতো ভালো অনুবাদ কীভাবে করে! তার বড় বোন ফাতেমা বলেন, ঘটনাক্রমে তার একটি ডায়েরি আমি পাই যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় দু'টি বিষয়বস্তু থাকত। একটিতে লেখা থাকত **'আমার জাগতিক জীবন'** এবং আরেকটিতে লেখা থাকতো **'আমার আধ্যাত্মিক জীবন'**। আর জাগতিক বিষয়বস্তুর পৃষ্ঠাটি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্ম ও জাগতিক লক্ষ্যসমূহের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর পৃষ্ঠাটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসমূহ, জামা'তের বিভিন্ন বিষয় ও ধর্মীয় জ্ঞানের

জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রতিটি পৃষ্ঠা খুব সুন্দরভাবে ও পরিকল্পিতভাবে লেখা থাকত। যুগ খলীফার প্রতিটি শব্দ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা আর সেগুলোর ওপর আমল করা এবং নিজ ভাইবোনদেরও সেগুলো পালনে নসীহত করা তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। জাপানী বান্ধবীদেরও ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতেন। আল্লাহ্ তা'লা উভয় মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করুন।

পরবর্তী বিবরণ হচ্ছে করাচীর চৌধুরী নাসীর আহমদ সাহেবের যিনি বর্তমানে ক্লিফ্টন জামা'তের সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি রাবওয়ার চৌধুরী নযীর আহমদ সাহেবের পুত্র। তিনি উনসত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তার স্ত্রী ও শ্যালককে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন এবং তিনি ইমামতি করছিলেন। দ্বিতীয় রাকাতে সেজদার সময় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি একজন মূসী অর্থাৎ ওসীয়্যতকারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযরত অবস্থায় মৃত্যু বরণকে একটি ঈর্ষণীয় মৃত্যু আখ্যা দিয়েছেন। তার পিতা চৌধুরী নযীর আহমদ সাহেবও অবসর গ্রহণের পর পঁচিশ বছর জামা'তের সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন, তিনি নায়েব নাযের যিরাআত (কৃষি) ও ওকীলুয্ যিরাআত (কৃষি) হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তার ছোট ভাই চৌধুরী নঈম আহমদ সাহেব বর্তমানে আঞ্জুমানের কোষাধ্যক্ষ। রেখে যাওয়া স্বজনের মধ্যে রয়েছেন তার স্ত্রী নুসরাত নাসীর সাহেবা, তার কোন সন্তান ছিল না। তিনি ১৯৭২ সালে করাচীতে স্থানান্তরিত হন আর সেখানেই তার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। সেখানে বিভিন্ন পদে থেকে তিনি জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, এমনকি অসাধারণ সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো পশ্চিম রাবওয়ার দারুর রহমত নিবাসী চৌধুরী নবী বখ্শ সাহেবের স্ত্রী সরদারা বিবি সাহেবার, যিনি কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত পাঠানকোটের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। এরপর তিনি হিজরত করে পাকিস্তান এসে প্রথমে শিয়ালকোটে পরবর্তীতে সিন্ধ অঞ্চলে বসবাস করেন। তার পিতামাতা ও পুরো পরিবার ছিল শিয়া মতাদর্শী। ১৯৪৯ সালে যখন তিনি তার পরিবার নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন তার পিতামাতা বলেন যে, তোমার স্বামী তো কাফের হয়ে গেছে তাই তুমি ফেরত চলে আস। তিনি তার পরিবারের সাথে নয় বরং তার স্বামীর সাথে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বয়আত করেনি। তারা তাকে বলে, তোমার স্বামী যেহেতু কাফের হয়ে গেছে তাই তুমি তাকে ছেড়ে দাও। এ কথা শুনে তিনি তার পরিবারকে উত্তর দেন যে, এখন তো আমি আরো ভালো মুসলমান হয়েছি। আপনাদের এখানে তো আমি কেবল ফজরের নামায পড়তাম আর এখন আমি কেবল পাঁচ ওয়াক্তের নামায-ই পড়িনা, বরং নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাযও পড়ি, আর এজন্য আমি ফিরে আসব না। চৌদ্দ বছর পর যখন তিনি তার নিজ বাবামার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন তখনও তারা খুবই অসৌজন্যতা দেখিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের হৃদয় নরম হয়নি আর তারা তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ করতেও আসেনি। জামাতের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ছিল। খিলাফতের সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দরিদ্রদের লালনপালনকারী, নেক এবং নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে ৩ পুত্র এবং ৪ কন্যা রেখে গেছেন। তার বড় ছেলে ডাক্তার আব্দুর রহীম সাহেবও সিয়েরা লিওনে পাঁচ বছর নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ছোট ছেলে আব্দুল খালেক নাইয়ার সাহেব মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে বর্তমান ক্যামেরুনে সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। তিনি

সেখানকার বর্তমান মুবাল্লেগ ইনচার্জ এবং আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন আর এ কারণেই মায়ের জানাযাতেও অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবাইকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)